T
43
ছায়াপথ

নূতন প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক উচ্চ ও মধ্য বিদ্যালয়সমূহের **অষ্টম শ্রেণীর** আবশ্যিক পাঠ্যরূপে অনুমোদিত দ্রুত পঠনোপযোগী বাংলা পদ্য-সংকলন।

(Vide Notification No. Syl/65/55, dated the 18th Oct. 1955. The Calcutta Gazette, Nov. 24, 1955).

ছায়াপথ

'জীবন ও রাত্রি', 'দক্ষিণায়ন', 'দ্বিপ্রহর', 'উলুখড়', 'ফতোয়া', 'সাবিত্রী', 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ', 'ভুখা-ভারত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

॥ সম্পাদিত ॥

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী লিমিটেড
৭২, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

চতুর্থ স্তবক ঃ

॥ প্রথম স্তবক ॥

মা যশোদার প্রতি কৃষ্ণ

॥ চণ্ডীদাস ॥

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠিল শ্যামল চন্দ্র।
মুখশশী খানি সুবাসিত জলে
ধোয়ল গোকুল চন্দ্র॥
স্নেহে যশোমতী আদর স্বভাবে
ক্ষীর নবনী আনি।
কানাই বদনে দিয়া সে যতনে
কহেন মধুর বাণী॥
"আজু বনে তুমি যাবে যাদুমণি
শুনিতে লাগয়ে ডর।
লোকমুখে শুনি বিষম কাহিনী
থাকয়ে কংসের চর॥"
কানু বলে, "মাতা না কর সংশয়
তোমার চরণ আশে।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংসচরে
তারে বা গণিয়ে কিসে॥"

মায়ের করুণ বচন শুনিয়ে
সে হেন যাদব রায়।
মধুর বচন করিয়া ছন্দন
আরতি করিছে মায়॥
"কোটি কংস তারে কটাক্ষ নিমিষে
করিতে পারি যে ধ্বংস।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংস মোরে
আমি যদুকুল বংশ॥"
মায়েরে তুষিয়ে চতুর কানাই
শুন গো বেদনী মায়।
বেশের রচনা করহ রচনি
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

আশে—আশীর্বাদে। বেদনী—বেদনাময়ী।

পশুগণের সহিত ভগবতীর কথোপকথন

॥ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ॥

[মুকুন্দরাম রচিত "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যের নায়ক কালকেতু ব্যাধের সহিত বার বার প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাজিত বনের পশুরা মা ভগবতীর শরণাপন্ন হয়। একজন সামান্য মানুষের কাছে সিংহ বাঘ গণ্ডার হাতীর মত ভয়ঙ্কর জন্তুরা বার বার পরাজিত হওয়ায় মা ভগবতী জন্তুদের নানারকম প্রশ্ন করিলেন এবং জন্তুরা উত্তর দিল। এই অংশটির মধ্যে জীব-জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।]

ভগবতী ॥ সিংহ তুমি মহা তেজা পশুমধ্যে তুমি রাজা
তোর নখে পাষাণ বিদরে।
শুনিয়া তোমার রা কাঁপয়ে সবার গা
কি কারণে ভয় কর নরে ?

সিংহ ॥ বীর ক্ষত্রি অদ্ভুত দ্বিতীয় যমের দূত
সমরে হানয়ে বীরবত।
দেখিয়া বীরের ঠাম ভয়ে তনু কম্পমান
পলাইতে নাহি পাই পথ ॥

ভগবতী ॥ আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ কে পায় তোমার লাগ
পবন জিনিতে পার জোরে।
তব নখ হীরাধার দশন বজ্রের সার
কি কারণ ভয় কর নরে ?

বাঘ ॥ যদি গো নিকটে পাই ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই
কি করিতে পারি আমি দূরে !
ব্যর্থ নহে তার বাণ এক বাণে লয় প্রাণ
দেখি বীরে প্রাণ কাঁপে ডরে ॥

ভগবতী ॥ পশুমধ্যে তুমি গণ্ডা উত্তম তোমার খাণ্ডা
বিরোধ না কর কার সনে।
তুমি যদি মনে কর প্রলয় করিতে পার
নরে ভয় কর কি কারণে ?

গণ্ডার ॥ কালকেতু মহাবীর দূর হইতে মারে তীর
খড়্গো তার কি করিতে পারে !
বীরের অস্ত্রের বেগে বত্রিশ দশন ভাঙ্গে
পশুগণ মহামারী করে ॥

ভগবতী ॥ হস্তী তুমি মহাশয় তোমার কিসের ভয়,
বজ্রসম তোমার দশন।
তোর কোপে যেই পড়ে যম-ঘরে সেই নড়ে
কেবা ইচ্ছে তব দরশন ॥

হস্তী ॥ মোর পিঠে মারে বাড়ি লয়ে যায় তাড়াতাড়ি
উলটিয়া শুণ্ডে মোর খোঁচে।
দুই চারি ক্রোশ যায় তবে মোর লাগ পায়
ছাগলের মূলে লয়ে বেচে ॥

ভগবতী ॥ শুন হে মহিষ, বাণী মানুষ তোমার প্রাণী
তুমি হও যমের বাহন।
তুমি যদি মনে কর পর্বত চিরিতে পার
নরে ভয় কর কি কারণ ?

মহিষ ॥ কালকেতু বড় লড়ে বলেতে ফেলয়ে গাড়ে
পড়িলে উঠিতে নাহি পারি।
অনেক সন্ধান জানে গাছে উঠে মারে বাণে
নর মধ্যে আমি তারে হারি ॥

ভগবতী ॥ খসয়ে যেমন তারা সেই রূপ ধাও বরা
তোর দন্তে ক্ষিতি জর জর।
কালকেতু একা নর সবে ধরে তিন শর
কি কারণে তারে কর ডর ?

বরাহ ॥ নিবেদন করি মাতা শুনহ বীরের কথা
পশু মারে বিবিধ প্রকারে।
অনেক জানয়ে তন্ত্র এড়য়ে বড়শী যন্ত্র
বিনা অপরাধে পশু মারে ॥

ভগবতী ॥ তুলারু ঘোড়ারু মৃগ পবন জিনিয়া বেগ
কালসার বীর মহাশয়।
যদ্যপি মনেতে কর পবন জিনিতে পার
কি কারণে নরে কর ভয় ?

ঘোড়া, মৃগ প্রভৃতি ॥
যাহারে কেশরী ডরে তাড়িয়া কুঞ্জর ধরে
আমরা তাহার ঠাঁই মশা।
কৃপা কর কৃপাময়ী তোমার শরণ লই
চিরদিন তোমার ভরসা ॥

বরা—গর্জন। বীরবত—বীরের মত। লাগ—সঙ্গ। হীরাধার—হীরার ধার যেমন কিছুতেই নষ্ট হয় না, তদ্রূপ তীক্ষ্ণ। গাড়ে—গর্তে, খানায়। বড়শী—মাছ ধরার বড়শীর মত কাঁটাওয়ালা অস্ত্র।

রাবনের মৃত্যুবান হরন

॥ কৃত্তিবাস ওঝা ॥

বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥

মন্দোদরী নিকটেতে আছয়ে নির্যাস।
সে বাণ আনিলে হয় রাবণ বিনাশ॥

মন্দোদরীর অন্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে না যান॥

হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি।
আমি গিয়া মৃত্যুবাণ আনিব এখনি॥

এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়া।
জম্বুবান সুগ্রীবের পদধূলি লৈয়া॥

ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
মায়া করি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ॥

জ্যোতিষ গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত।
এত বলি রানীর অগ্রেতে উপস্থিত॥
রানী দিল সিংহাসন তাহে না বসিয়ে।
কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে॥
দ্বিজ বলে আমি বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত।
চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত॥
নর-বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ।
রাজার হউক জয় করি আশীর্বাদ॥
জ্যোতিষ গণনে জানি যত সমাচার।
রাজার জীবন-মৃত্যু গৃহেতে তোমার॥
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর।
প্রকাশিয়া না কহিবে কাহারও গোচর॥
এতেক কহিয়া উঠে চলে দ্বিজবর।
কহে রানী মন্দোদরী করি যোড়কর॥
কি ধন গৃহেতে মম আছয়ে এমন।
জ্যোতিষেতে কি দেখিলে করিয়া গণন॥
দ্বিজ বলে মন্দোদরি করো না ছলনা।
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনা॥
ঘরভেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী।
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্ত্রণা করি॥
বিভীষণ-অজ্ঞাত লঙ্কাতে নাহি স্থান।
কিরূপে রাবণ রাজা পাবে পরিত্রাণ॥

মন্দোদরী বলে দ্বিজ না ভাব অন্তরে।
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে ॥
পরম হিতৈষী তুমি রাজার পক্ষেতে।
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥
তব আশীর্বাদে তাহা কে লইতে পারে।
রেখেছি জড়িত এই স্তম্ভের ভিতরে ॥
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়া মারুতি।
ভাঙ্গিল স্ফটিকস্তম্ভ মারি এক লাথি ॥
ভাঙ্গিতে স্ফটিকস্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ।
বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান ॥
নিজ মূর্তি ধরি গিয়া বসিল প্রাচীরে।
আর এক লাফে গেল রামের গোচরে ॥
বাণ দিয়ে রঘুনাথে করিল প্রণাম।
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম ॥

॥ ভারতচন্দ্র রায় ॥

ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥

প্রেত ভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ড গোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে॥

সৈন্যসূত মন্ত্র পূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অশ্ব ঢালি মাহুতি॥

বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁদি খাও দক্ষ দেয় হাঁকিয়া॥

সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নির্বৃতি।
দক্ষ রাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি॥

রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দীভৃঙ্গী সঙ্গিয়া।
ঘোর বেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধ রঙ্গ রঙ্গিয়া॥

ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁপ ছিঁড়িল।
পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল॥

বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কিল মারিছে॥

ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥

যজ্ঞ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্য কব্য খাইছে।
উর্ধ্ব হাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাইছে॥

মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥

অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥

উর্ধ্ব বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প নাগ কর্ম লাড়িছে॥

অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষ দেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে॥

রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হুল স্থুল কুল কুল ব্রহ্মাডিম্ব ফুটিছে॥

মৌন তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে॥

মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে॥

॥ দ্বিতীয় স্তবক ॥

পাঁটা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
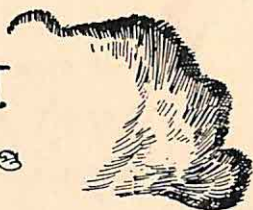
রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্।
সাধু সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান॥
ত্রিতাপেতে তরে লোক তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে থোপ॥
সে সময়ে অপরূপ মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র কথা কয় বোবা॥
শুধু যায় পেট ভরে পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি কাছে থাক বাঁধা॥
সাদা কাল কটা রূপ বলিহারী গুণে।
সাত পাত ভাত মারি ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥
জ্বাল দিতে কাল যায় লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয় বাটনার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদয় লয়ে।
হাড়সুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে॥

মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ ?
যত চুষি তত খুশী হাড়ে হাড়ে রস ॥

গিলে গিলে ঝোল খায় আস্বাদন-হত।
তাদের জীবন বৃথা দাঁত পড়া যত ॥

টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥

ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু ॥

সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা ॥

কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে ॥

মহতের কার্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হ'ত আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে ॥

এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ ॥

এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়েবংশে বোকা ॥

——
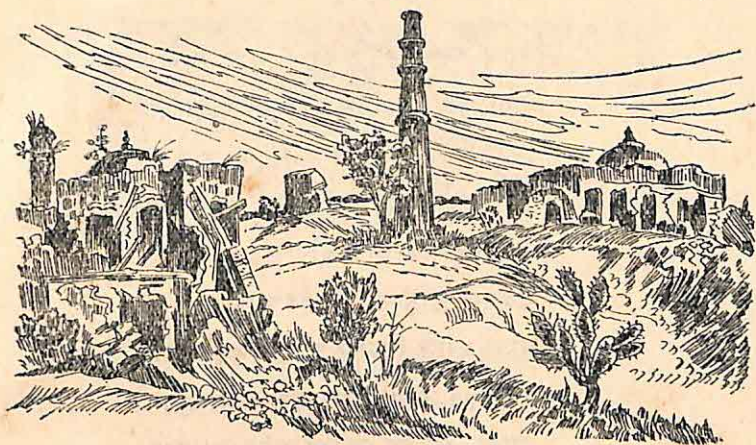
চিতোর

॥ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ,
ভারতের নানা দেশ করি পর্যটন,
হেরি বহু রাজপুরী, সানন্দ অন্তরে,
প্রবেশেন একদিন চিতোর নগরে।
দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর,
তার নিম্নে শোভাকর সুন্দর নগর।
গিরি'পরে শোভে গড় প্রাচীরে বেষ্টিত,
রাজচক্রবর্তী-হিন্দুসূর্য-প্রতিষ্ঠিত।
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর,
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর।
কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর,
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর ;

তরুণ-অরুণ-ভাতি জ্বলে কোন স্থলে,
প্রবালের যেন বৃষ্টি হ'য়েছে অচলে ;
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে,
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে।
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার,
ঝলমল ভানু-করে করে অনিবার ;
নানা-জাতি বিহঙ্গে সুরঙ্গে করে গান,
সন্তাপীর তাপ নাশে, হরে মনঃপ্রাণ।
আহা, এইরূপ শোভা অতি অপরূপ,
উথলয় ভাবুক জনের ভাব-কূপ !
সরসী, সরিৎ, সিন্ধু, শেখর সুন্দর,
গহন, গহ্বর, বন, নির্ঝর-নিকর,
দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্র মণ্ডল,
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল ;
ইহ খলু নিসর্গের শোভা অনুপম ;
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাস-বিভ্রম।
আয় মন ! চল যাই, সেই সব দেশে,
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে।
দেখিবে বিচিত্র শোভা, শৈল আর জলে
শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে,
কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ
নয়ন জুড়াবে, যাবে সমুদয় ক্লেশ।

সীতা ও সরমা

॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ॥

ভাসিছে কনক লঙ্কা আনন্দের নীরে,
স্থবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।

রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে —
সৌরভে পুরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা হুয়ারে হুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তারে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে !—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরী-দলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে

রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে ;” আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে !
স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! নড়িছে বিষাদে
মর্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখি ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী !

না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব রূপে!

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে ; সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে।

কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে ; "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে
এ বেশ ? নিষ্ঠুর হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি!"

কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!

দিয়া ফোঁটা, পদধূলি, লইল সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে।"

এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে। আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী,—
......"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ। সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে!
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে!
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি।
আর কি কহিব, সখি ? কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন! দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?"

নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা ;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি!
না চাহে পরান মম ছাড়িতে তোমারে,

রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, একথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে !"

কহিল মৈথিলী ; "সখি, যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।"

আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

———

॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কি শোভা ধরেছে তরু খদ্যোতমালায়,
শাখা খণ্ড সমুদয়, হয়েছে আলোকময়
কি চারু সুন্দর শোভা জুড়ায় নয়ন !
নীল আভা পুচ্ছে ঝরে শোভিতেছে তরু'পরে
লক্ষ আলোকের বিন্দু ফুটিছে যেমন।
হেরে মনে হয় হেন সোনার তরুতে যেন
লক্ষ হীরাখণ্ড জ্বলে, জড়িত কাঞ্চন।
কখন বা মনে হয় তরুটি যেমন
আলোকে ডুবিয়া আছে, সর্ব অঙ্গ জ্বলিতেছে
মনোহর নীলকান্ত কাঞ্চন-কিরণ।
অথবা যেন বা কেহ অসিত বসনে,
বিন্দু বিন্দু স্বর্ণফুলে চারু কারুকার্য তুলে
ঢাকিয়া রাখিছে তরু করি আচ্ছাদন।
কিন্তু পরদিন প্রাতে উদিলে তপন
কাছে গিয়ে হের তায় কোথায় কাঞ্চন হায়
দারুময় তরু সেই পূর্বের মতন।
কোথা বা হীরকমালা নয়ন-রঞ্জন
তরুতলে ডালে গাছে দেখিবে পড়িয়া আছে
কেবল জোনাকি পোকা পাঁতি অগণন।
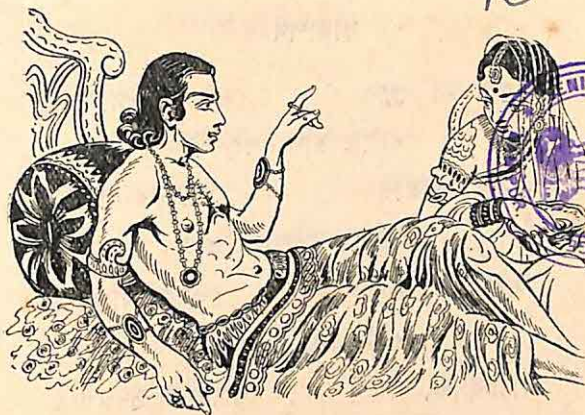
স্বর্গরাজ্য উত্তরার

॥ নবীনচন্দ্র সেন ॥

সুবর্ণ প্রদীপ, সুগন্ধ বিতরি
সুমন্দ আলোক সহ,
আলোকিছে চারু পার্থের শিবির,
বহে ধীরে গন্ধবহ।
দুই পর্যঙ্কেতে শুয়ে দুইজন—
ধনঞ্জন, জনার্দন।
সুভদ্রা কৃষ্ণের, উত্তরা পার্থের,
ঔষধ অঙ্গে লেপন
করিছে আদরে,— বিষাদিত মুখ
মেঘমাখা চন্দ্র যথা।
কহিছেন হর্ষে শ্রান্ত কৃষ্ণার্জুন
দিবসের রণকথা।

উত্তরা না শুনে সেই বীর-গাথা
তা'তে তার নাহি প্রীতি।
নীরবে তাহার নয়নের ধারা
পড়িছে কপোল তিতি।
"সর্ব অঙ্গ ক্ষত! কেমনে মানুষ
এমন নিষ্ঠুর হয়?
বীরের কি, বাবা! থাকে না হৃদয়?
তুমি ত করুণাময়।"
দেখিলা অর্জুন কাঁদিছে উত্তরা,—
অশ্রু নহে স্নেহাসার;
চুম্বিয়া মু'খানি বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে
কহিল—"বাছা আমার!
বীর-ধর্ম যুদ্ধ, এ ত আর তোর
নহে পুতুলের রণ।
বীর-বালা তুই, দেখি অস্ত্র-লেখা
কাতর কেন এমন?"
"না না বাবা! আমি না পারি বুঝিতে,
পোড়া বীর-ধর্ম ছাই,
সংসার ছাড়িয়া যাক যমপুরে
লইয়া সব বালাই।
একটি কণ্টক চরণে তোমার
ফুটিলে উত্তরা তব
না পারে সহিতে, নিত্য এত ক্ষত
কেমনে পরানে স'ব?

কেন এই রণ? কেন দেব-অঙ্গ
এইরূপে কর ক্ষত?
কে আছে জগতে তোমাদের মত
কে সুখী আমার মত?"
সুবর্ণ দর্পণ সে ক্ষুদ্র ললাটে
আদরে বুলায়ে কর,
কুঞ্চিত কুন্তল সরাইয়া ধীরে,
উত্তরিলা বীরবর—
"পিতৃরাজ্য বাছা! করিব উদ্ধার,
রাজা হবে অভি মম;
তুই হবি রানী বসি বামে তার,
ইন্দ্র পাশে শচীসম।"
অধোমুখী বামা কণ্ঠ ছল ছল
কহিল বীণার স্বরে
কণ্ঠ মূর্ছনায় নারী হৃদয়ের
অমৃত বর্ষণ ক'রে,—
"যেই তিন রাজ্য পাইয়াছি আমি,
রাজ্য কিবা আছে আর?
তোমার, মায়ের, নারায়ণ-পদ,—
স্বর্গ রাজ্য উত্তরার!
আমার সমান ভাগ্যবতী, বল,
কে আছে জগতে আর?
তোমাদের স্নেহ, ক্ষুদ্র হাসিটুকু,
স্বর্গ-রাজ্য উত্তরার!"
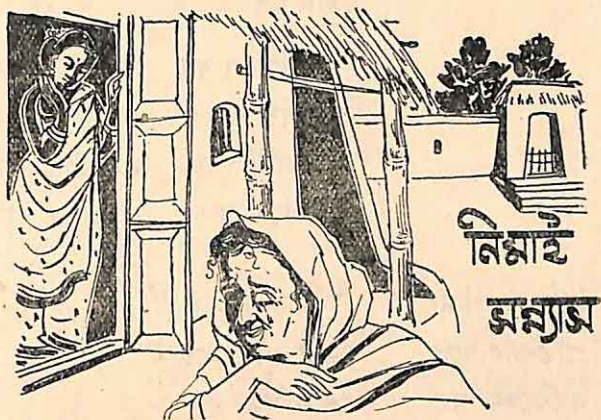
এ পোড়া ধরার রাজ্যে কিবা সুখ ?
নিত্য এই কাটাকাটি ;
কে কারে মারিয়া কে কারে খাইবে,—
এ সংসার কান্নাহাটি !
করে পুত্রহীনা মাতা হাহাকার ;
পতিহীনা কত নারী
কাঁদিছে অনাথ শিশু ল'য়ে বুকে,—
প্রাণে না সহিতে পারি !
এ রাজ্য ছাড়িয়া চল যাই বনে,
বাঁধিয়া কুটির ঘর,
তোমাদের পদ সেবিবে উত্তরা,—
সে রাজ্য কি সুখকর !"

॥ শিবনাথ শাস্ত্রী ॥

আজি শচীমাতা কেন চমকিলে
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে ?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে 'নিমু' 'নিমু' ব'লে
দ্বার খুলি মাতঃ কেন বাহিরিলে ?

"বউ মা ! বউ মা ! ঘুমায়ো না আর
উঠ অভাগিনী দেখ একবার,
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই
বুঝি-বা পালাল করি অন্ধকার !"

তাই বটে হায় বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিত সরলা কামিনী ;
"শূন্য পড়ি ঘর কোথা প্রাণেশ্বর !"
"গেছে গেছে" কহি উঠে বিনোদিনী ।

"সে কি বল বউ ওমা সে কি কথা!
হা মোর নিমাই পলাইল কোথা?"
পাগলিনী প্রায় দ্বারে গিয়া হায়
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা।

ডাকেন জননী "নিমাই, নিমাই!"
প্রতিধ্বনি বলে "নাই, নাই, নাই!"
ডাকিছেন যত শোকসিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে কোথা রে নিমাই;

গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে
সেই প্রতিধ্বনি "যাই যাই" করে;
ভাবেন জননী আসে গুণমণি,
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে;

"নিমাই! নিমাই!" হা মাতঃ সরলে,
পাগলিনী হলে সকলেই ছলে,
কাঁদ মা জননী তব গুণমণি
আঁধারে লুকায়ে ওই গেল চলে।

শচীমাতা কাঁদে ঘর ফেটে যায়,
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে পুতলির প্রায়
দাঁড়ায়ে ললনা বিষণ্ণ বদনা
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায়।

রজনী পোহাল দিক প্রকাশিল
শচীর ক্রন্দন গগনে উঠিল,
উঠি প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি
"কি হইল ?" বলি দ্বারেতে আসিল।

ঘরে আসি দেখে সে ঘর আঁধার
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর ;
শিরে কর দিয়ে পড়িল বসিয়ে
"হায় কি হইল !" মুখেতে সবার।

এদিকেতে গোরা অতিবেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায় ;
হরি গুণগান করি' পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

'নিশি'তে ডাকিল লোকে যায় যথা ;
নিজ মনে গোরা চলিছেন তথা,
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ
আর বার ভাবে জননীর কথা।

কহেন সঘনে, "কোথা দয়াময় !
রহিল জননী ক'রো যাহা হয় ;
আমি দ্বারে দ্বারে ঘোষিব তোমারে
এ দেহে জীবন যতকাল রয়।"

"নির্ম্মলা প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী,
তারে দয়া করি তবে দেখ হরি
ক'রো ক'রো নাথ তাহার সদগতি।"

"প্রিয় নবদ্বীপ প্রিয় ভাগীরথি!
ছেড়ে যাই আমি দেও অনুমতি!
হরি সংকীর্ত্তনে তোমা' দুইজনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি।"

এত বলি গোরা নদে ছেড়ে যায়
নদেপুর শোকে করে হায় হায়!
কারে কি যে কর জান হে ঈশ্বর
দেখে শুনে কবি হতবুদ্ধি প্রায়।

কর্তব্য

॥ গোবিন্দচন্দ্র দাস ॥

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক !
এ সংসার কর্মশালা,
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা,
পুড়িতে হইবে খাদ থাকে যতটুক,
অযুত আঘাতে নিত্য,
গড়িতে হইবে চিত্ত,
যুদ্ধ জয়েচ্ছুক।
দিতে হবে বজ্রশাণ,
উজ্জ্বল করিতে প্রাণ,
তবে সে উজ্জ্বল হবে মুখ।

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শিরোপরে শত বজ্র গর্জিবে গর্জুক !
রহ হিমাদ্রির মত,
হইও না অবনত,
পতঙ্গের পদাঘাতে তৃণ অধোমুখ।
হ'লে হও খণ্ড খণ্ড,
সৃষ্টি করি' লণ্ডভণ্ড,
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক।
গম্ভীর গৌরব ভরা,
মহাদম্ভে ভেঙে পড়া,
কি আনন্দ, কি প্রচণ্ড সুখ !

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
অনন্ত মরণ যদি আসিবে আসুক!
স্থাপ তুমি জয়স্তম্ভ,
কর আত্ম অবলম্ব,
দেও অস্থি মেদ মজ্জা লাগে যতটুক,
শত সূর্য করি গুঁড়া,
গড় সে উজ্জ্বল চূড়া,
দেবতা দেখুক।
বাধা বিঘ্ন ঠেলি পদে,
সিংহ ফিরে বীরমদে,
আত্মগুপ্ত সভয়ে শম্বুক।

ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
সংসারের শত দুঃখ আসিবে আসুক।
ক্ষুধাতুর শিশু বক্ষে,
উপবাসী নারী চক্ষে
চাহিয়া দেখ না তার ম্লান অশ্রুটুক,
ফিরিয়ে শুন না তার,
অন্ন বিনা হাহাকার,
কাঁদিবে কাঁদুক!
বীরের সন্ন্যাস ধর্ম,
ছিঁড়ে ফেলা হৃন্মর্ম,
কর্তব্য সাধিতে জাগরূক।

———

॥ তৃতীয় স্তবক ॥

জননী বঙ্গভূমি

।। স্বর্ণকুমারী দেবী ।।

শতকণ্ঠে কর গান
জননীর পূত নাম
মায়ের রাখিব মান
লয়েছি এ মহাব্রত।

আর না করিব ভিক্ষা
স্ব-নির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা,
এই জপ অবিরত।

সাক্ষী তুমি মহাশূন্য
না লব বিদেশী পণ্য
ঘুচাব মায়ের দৈন্য,
করিলাম এ শপথ।

পরি ছিন্ন দেশী সাজ
মানি ধন্য ধন্য আজ,
মায়ের দীনতা লাজ
হবে দূর পরাহত!

এই আমাদের ধর্ম
এই জীবনের কর্ম
এই মন্ত্র এই ধর্ম
আমাদের মুক্তিপথ।

নমো বঙ্গ বঙ্গভূমি
মোদের জননী তুমি
তোমার চরণে নমি
নরনারী মোরা যত ॥

দুই পাখি

।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।।

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হোলো দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।"
খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখি বলে, "না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!"

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখি পড়ে শিখানো বুলি তার—
দোঁহার ভাষা দুই-মতো!
বনের পাখি বলে, "খাঁচার পাখি ভাই
বনের গান গাও দিখি।"
খাঁচার পাখি বলে, "বনের পাখি ভাই
খাঁচার গান লহো শিখি।"
বনের পাখি বলে, "না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
আমি কেমনে বন-গান গাই!

বনের পাখি বলে, “আকাশ ঘন নীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।”
খাঁচার পাখি বলে, “খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।”
বনের পাখি বলে, “আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।”
খাঁচার পাখি বলে, “নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।”
বনের পাখি বলে, “না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।”
খাঁচার পাখি বলে, “হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।”

এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা,
কাতরে কহে, “কাছে আয়।”
বনের পাখি বলে, “না,—
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখি বলে, “হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার” ॥
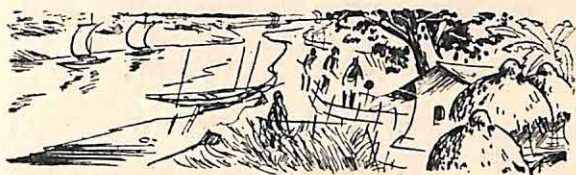
মেঘমুক্ত

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়,
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায়।
ঝিকিঝিকি করি কাঁপিতেছে বট,
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট,
পথের হু ধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায়।
ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয় ॥

তোমাদের সেই ছায়াঘেরা দিঘি না আছে তল,
কূলে কূলে তার ছেপে ছেপে আজি উঠেছে জল।
এ ঘাট হইতে ও ঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে তালতলায়।
আজ ভোর হতে নাই গো বাদল, আয় গো আয় ॥

তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা,
খঞ্জন দুটি আলস্য ভরে ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমিরনিবিড় ঘনঘোর ঘুমে স্বপনপ্রায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল, আয় গো আয়॥

মেঘ ছুটে গেল, নাই গো বাদল, আয় গো আয়—
আজিকে সকালে শিথিল কোমল বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল-'পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে আছে বক গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল, আয় গো আয়॥

———

দীন দান

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

নিবেদিল রাজভৃত্য, 'মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নামসংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দর-দর উদ্বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্য প্রায়
দেবাঙ্গন ; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার 'পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।'

শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি, যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে ; কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,

'হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে?'
'সে মন্দিরে দেব নাই' কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
'দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-'পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা?'
'শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ' সাধু কহে,
'আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।'

ভ্রূ-কুঞ্চিয়া কহে রাজা, 'বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাহি কোনো স্থান!'

শান্ত মুখে কহে সাধু, 'যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন, অন্নবস্ত্রহীন,
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদৃপ্ত ঘর

দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান—
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা-মাঝে ; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে,
সে আমারে গৃহ করে দান।' চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথ প্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়,
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্‌বুদ্‌।'

রাজা জ্বলি রোষানলে,
কহিলেন, 'রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্তে চলি যাও।'

সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে.
'ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে,
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত কর ভক্তজনে।'

চাহিবে না ফিরে ?

॥ কামিনী রায় ॥

পথে দেখে ঘৃণাভরে কত কেহ গেল সরে'
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি বরষি গঞ্জনা রাশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে'।

পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দু'টি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে' অসহায় পদে তারে দলে যায়,
দুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়া'বার ?

বর্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে তুলিবে না হাত ধরে',
অর্ধ দণ্ড তা'র লাগি থামিবে না ভাই ?

তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া
তোমাদেরি হাত ধরি হোক অগ্রসর ;
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি দাও তা'রে
আঁধার রজনী তা'র রবে নিরন্তর।

———

জীবন ভিক্ষা

(বুদ্ধদেব প্রতি কিসা গৌতমী)

।। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো, দুলালে আগলি' বক্ষে,
বিয়োগ-উৎস উষ্ণ সরিতে দর-বিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন,— চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন !
অভাগী বিহগী দারুণ আহত মরণ-শ্যেনের পক্ষে !

স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লাগিছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন পরসাদ মধুরসে পরিসিক্ত।
মুখচম্পকে মরুর বর্ণ, শুষ্ক অধর-কমল-পর্ণ
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু সুধার বিন্দু-রিক্ত ?

অমরা-মাধুরী আধ আধ বুলি কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন,
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি পুণ্যহাসির চিহ্ন ?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে, ননীর পুতলি জাগিবে হরষে !
কোন পাষাণের বিষমাখা বাণে এ নয়ন-মণি ভিন্ন ?

কানন হয়েছে আমার ভূবন সুখশশী রাহুগ্রস্ত,
ধাই দিশেহারা—রোদনের রোলে ধ্বনিয়া উদয়-অস্ত।
যে দিকে তাকাই, বাছা মোর নাই !
প্রাণ দিলে যদি প্রাণ ফিরে পাই—
উড়িয়া উড়িয়া শ্মশানের ছাই ভরিল বিকল হস্ত।

অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ, দুরগম পথ ক্ষুর-ধার-সম সূক্ষ্ম।
দিলে তপোবল, মহানির্বাণ, কুমারে আমার কর প্রাণদান—"
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে আলুথালু কেশ রুক্ষ!

চাহেন শুদ্ধ, সৌম্য, শান্ত গৌতম ধ্যান-ভঙ্গে,
অখিল-পাবন করুণা-জ্যোৎস্না বরষি' বালক-অঙ্গে,—
নিমেষের তরে মেলিবে কি চোখ? উথলি' অরুণ পুলক-আলোক,
নিবাবে আগুন কিসা-গোতমীর শিশুহারা উৎসঙ্গে?

কহেন বুদ্ধ "কুমার তোমার নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর মরণের মহালগ্ন;
থাকে যদি কোথা অশোক-আলয়, ভিখ্ মাঙি' আন সর্ষপ-চয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা;
নিবেদিল শেষে গুরু পদে এসে, শিখাইলে শেষ শিক্ষা,—
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার,
হর' জগতের বিরহ-আঁধার দাও গো অমৃত-দীক্ষা"
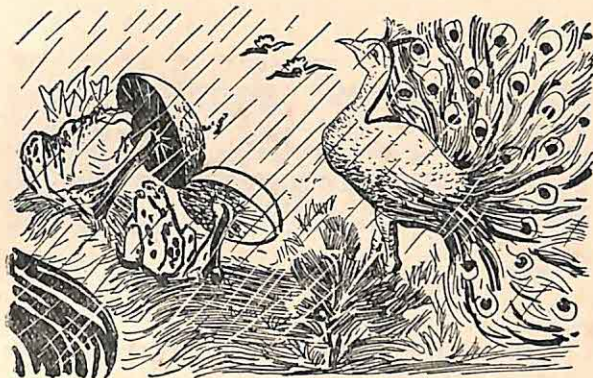
বর্ষা

॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

ঐ দেখ গো আজকে আবার পাগ্‌লি জেগেছে,
ছাই মাখা তার মাথার জটায় আকাশ ঢেকেছে !
মলিন হাতে ছুঁয়েছে সে ছুঁয়েছে সব ঠাঁই,
পাগল মেয়ের জ্বালায় পরিচ্ছন্ন কিছুই নাই !

মাঠের পারে দাঁড়িয়েছিল ঈশান কোণেতে,—
বিশাল-শাখা পাতায়-ঢাকা শালের বনেতে ;
হঠাৎ হেসে দৌড়ে এসে খেয়ালের ঝোঁকে,
ভিজিয়ে দিলে ঘরমুখো ঐ পায়রাগুলোকে !

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায় ;
ভয় দেখিয়ে হাসে আর ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে !

ময়ূর বলে 'কে গো ?' এ যে আকুল-করা রূপ।
ভেকেরা কয় 'নাই কোন ভয়,' জগৎ রহে চুপ ;
পাগ্‌লি হাসে আপন মনে পাগ্‌লি কাঁদে হায়,
চুমার মত চোখের ধারা পড়ছে ধরার গায়।

কোন মোহিনীর ওড়না সে আজ উড়িয়ে এনেছে,
পুবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে আমার অঙ্গে হেনেছে ;
চমকে দেখি চক্ষে মুখে লেগেছে এক রাশ,
ঘুম-পাড়ানো কেয়ার রেণু, কদম ফুলের বাস !

বাদল হাওয়ায় আজকে আমার পাগ্‌লি মেতেছে ;
ছিন্ন কাঁথা সূর্যশশীর সভায় পেতেছে !
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত !

পুষ্প-জীবন

॥ মোহিতলাল মজুমদার ॥

ফুল যবে ঝরে যায় ভেবেছ কি মরে যায় ?
শেষ হয় চিরতরে তার রূপ-সৌরভ ?
সে যে ফিরে ফিরে আসে বছরের সেই মাসে—
দেখ না কি সেই রঙ্, সেই শোভা সেই সব !
ফাগুনে অশোকশাখে যে সব কোকিল ডাকে
আকাশে যে চাঁদ হয় বারে বারে পূর্ণ ;
আষাঢ়ে মাঠের শেষে নীল মেঘ উঠে ভেসে
অঘ্রানে তৃণে তৃণে সেই হীরা চূর্ণ ;
বলে সে কি মনে হয় তা'রা সব এক নয় ?
আগেকার থেকে তা'রা একতিল ভিন্ন ?
মরে' তা'রা বাঁচে ফের পাছে কেউ পায় টের—
তাই কোথা নাহি রাখে মরণের চিহ্ন।
ফুলেদেরো ঠিক তাই ! তা'রা ত' মরে না, ভাই,—
যখন যেখানে ফোটে সেই নাম সেই ফুল !
তা'রা যে আপন জন ধরার বুকের ধন—
মাটিতে জনম যা'র অমর যাহার মূল !

* * *

ওদের মুখের 'পরে শুধু আলো খেলা করে
শিশিরে কাঁদে না ওরা বাড়ে তায় সৌরভ !
এক সাথে ফোটে ঝরে, ঝরে তবু নাহি মরে
ওরা যে সবাই এক তাই হেন গৌরব।

কোজাগর লক্ষ্মী

॥ যতীন্দ্রমোহন বাগচী ॥

শঙ্খ-ধবল আকাশ-গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পালটি মেলে'
জ্যেৎস্না-তরী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?
ক্ষীরোদ-সাগর-ছেঁচা চাঁদের টীপটি দেখি ললাট পটে,—
কুমুদমালার বরণডালা লুটায় তব চরণতটে,
কাশের কোলে চামর দোলে, ছত্র শোভে ছাতিম ফুলে,
আসন তোমার পাতা দেখি শুক্তি-গাঁথা নদীর কূলে—
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার দাঁড়ালে মোর কুটির-দ্বারে,
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে এসে মুক্তা-ধবল ধরার পারে ?
কে বলে রূপ নাই দেবতার—কে বলে তাঁর মূর্তি নাহি ?
যে বলে সে নয়ন মেলে' আজকে রাতে দেখুক চাহি'।
কোজাগরের লক্ষ্মী হের—এলেন আজি মূর্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ' ভাগ্যবতি ;
গাঁথ' মালা শুভ্রফুলে, সাজাও ডালা লাজের রাশে ;
শ্বেতপাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুক্ল শাঁসে ;
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর,
শঙ্খপরা গৌর হাতে ঘৃতের দীপটি তুলে' ধর ;
আত্মা'পরে দৃষ্টি রাখ, মনের মলা ফেল' ধুয়ে—
শুভ্র প্রাণে শুক্লবাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।
প্রণাম কর—উর্ধ্বে হের বিশ্বভুবন সিক্ত করে'
মায়ের আশিস-কিরণ-ধারা মাথার 'পরে পড়ছে ঝরে' ;
নেত্রমনের তৃপ্তিভরা দীপ্তিমতী মূর্তিখানি—
দেখরে চেয়ে অবিশ্বাসী কোজাগরের লক্ষ্মীরানী।

পুরাতত্ত্ববিৎ

॥ রজনীকান্ত সেন ॥

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

দণ্ডক কাননে ছিল ক'টা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

(মহম্মদ) গজনী খেতেন কি কি তরকারী,
সেটা জেনে রাখা কত দরকারী,
ছু'শ মাথা ছিল এক চরখারই,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ব্রজ গোপীগণ গণিয়া বিষাদ
রুটি খেত, কিংবা খেত ডা'ল ভাত,
প্রত্যহ ক'ফোঁঠা হত অশ্রুপাত,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ক'আঙুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়ের ছিল ক'টা টিক্‌টিকি,
গৌতম-সূত্রে রেশম-সূত্রে প্রভেদ কি কি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

কৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল ক'টা ছ্যাঁদা
দিলীপের বাগানে ছিল কিনা গ্যাঁদা,
কোন মুখো হ'য়ে হয় লক্ষ্য বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

পেয়েছি একটা তাম্রশাসন
ক্রতুর ক'খানা ছিল কুশাসন
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির!

এ মাথাটা বড়ই ছিল উর্বর
বুঝিল না যত অসভ্য বর্বর !
এটা আঁধার প্রত্ন-তত্ত্বের গহ্বর
ইতিহাসামৃত-পায়ীর, আমি পানীয় ক'রেছি বাহির।

মজুরের মমতা

॥ কুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

পাষাণের মুখে আছে এত যে বাণী
আমি ত পাষাণ ভাঙি, তাহা কি জানি?
ভাঙিতে ভাঙিতে আজ মিলিল খুঁজি'
মা-ছেলে পাষাণে খোদা—সজীব বুঝি!
দুখিনী জননী তার হাতেতে ছড়ি
বালক চলেছে তা'র হাতটি ধরি।
ভাঙিতে গিয়াই আহা জননী পানে—
পড়িল আমার আঁখি, বাজিল প্রাণে।
হাতুড়ি তুলেছি, ছবি বলিছে, 'না-না—!'
ভাঙিতে করিছে যেন কাতরে মানা!
"আছি মোরা, যুগ যুগ গিয়াছে বয়ে—
ছাড়াছাড়ি ক'রনাকো মায়ে ও পোয়ে,
অন্ধের নড়ি মোর গ্রীষ্মের বা—
তিলেক পারিনে এরে ছাড়িতে বাবা।
দেশ গেছে, যুগ গেছে, মুছে গেছে ঘর
ছেলে লয়ে আমি আছি হইয়া পাথর।"
কোন যে যুগের মাতা কোন সে ছেলে,
পাষাণের বুকে আজ পরাণ পেলে।
পুতুলের মিনতিতে কাঁদিয়া মরি
ভাঙিতে পারিনে ছবি, বুকেতে ধরি।

ডাক-হরকরা

।। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।।

প্রভাতে ছুটিয়া আসি, অপরাহ্ণে ছুটে যাই আমি
পুলিন্দা বহিয়া ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু উড়ায় বিদগ্ধ বালুকণা
রহিয়া রহিয়া।

জ্বরক্লিষ্টা ধরণীর শীর্ণ তীব্র নাড়ী, তার
স্পন্দনের মতো,
দীর্ঘ দগ্ধ রাজপথে আমার দুর্ভর পদক্ষেপ
পড়ে অবিরত !

পান্থ ! তুমি ভাবিতেছ বটচ্ছায়ে বসি',—কে ছুটে রে
কি আশার টানে ?
আমার সময় নাই ভেবে নিতে—কেন ছুটে যাই,
কিসের সন্ধানে !

শুধু জানি যেতে হবে—সেই সেথা নদীর ওপারে,
শূন্য রণভূমে ;
বৃদ্ধ ক্লান্ত দিবা যেথা লক্ষ-রক্তকর-বিদ্ধ হয়ে
শরশয্যা চুমে !

রাত্রি যেথা ছেয়ে আসে একটানা লয়ের মতন
ছন্দ-তাল-হীন ;
পুলিন্দা নামায়ে সেথা একবার মুছিব ললাট,
ঘর্মাক্ত মলিন।

সেথায় পড়িয়া আছে অপর নূতন বাঁধা বোঝা—
স্কন্ধে তুলি' লব ;
প্রভাতের পানে ফিরি, নৌকা খুলি সেই রাতে পুনঃ
নদী পার হব।

বধূ তুমি ভাবিতেছ, 'ঝম্ ঝম্ ঝম্—কে যায় রে
কার অভিসারে ?'
কোথা যাই ? থাক্ চিন্তা, ওই উষা রাঙাইছে আঁখি
পূর্বাশার দ্বারে।

যে বোঝা বহিয়া আনি, শুনিয়াছি আছে এর মাঝে
নূতন বারতা ;
কত বিরহের শান্তি, হৃদয়ের কত না স্পন্দন—
মিলনের কথা !

শুনিয়াছি জগতের সবচেয়ে তীব্র প্রয়োজন
আছে এরি মাঝে ;
ত্রস্তে পথ ছাড়ে সবে, ডেকে কথা শুধায় না কেহ
দেরি হয় পাছে !

কে জানে, কাহার বোঝা কেন সর্ব বিপদ হইতে
প্রাণ দিয়ে রাখি।
দুর্দিনের বৃষ্টিধারে নিজ শির হ'তে ছত্র লয়ে
কেন তারে ঢাকি ?

ওগো, একদিন কেহ পথপার্শ্বে বাতায়ন হ'তে
ডেকে কথা কও ;
চির আনাগোনা হ'তে একদিন কোনো ছলে মোরে
ছিনাইয়ে লও।

ক্ষণিক বিশ্রামে মোরে দাও বুঝাইয়ে, কত শ্রান্তি
সঞ্চিয়াছে প্রাণে !
আমারে লওয়াও ছুটি এ অনন্ত ছুটাছুটি হ'তে
ব্যর্থ শূন্য পানে।

গোরুর গাড়ি

॥ কালিদাস রায় ॥

চলেছে গ্রামের পথে গোরুর গাড়ি
টাপ্পর হতে ঝুলে রঙিন শাড়ি,
মহাকলরব তুলি   চলে গাড়ি উড়ে ধূলি।
গাড়োয়ান, যাবে তুমি কাহার বাড়ি ?
এ গাঁয়ের বাড়ি নয়, যাবে ভিন গাঁয় ?
উপরে চাহিয়া দেখ দুপুর গড়ায়।
কচি বউ সাথে হেন   এত রোদে যাবে কেন ?
থামাও তোমার গাড়ি গাছের ছায়ায়।

চারিদিক ঘেরা গাড়ি, মাঝারে তাহার
ঘামিতেছে কচি মেয়ে হয়নি আহার।
ক্ষুধায় শুকানো মুখ   দুরুদুরু বুঝি বুক,
খেয়ে-দেয়ে ও-বেলায় চলিও আবার।
আমাদের মেয়ে আছে ওরি বয়সী,
ওরি বয়সের কত পাড়াপড়শী।
সবে মিলে-মিশে বেশ   ঘুচাবে পথের ক্লেশ,
আঁচলে মুছাবে তারা মুখের মসী।

তাদের পাঠায়ে দিই, থামাও গাড়ি,
পুকুরের পাড়ে অই আমার বাড়ি।
কোন্ জাতি জানি না তা'   তবু সে আমারি মাতা,
ব্রাহ্মণী রাঁধা ভাত রেখেছে বাড়ি'।

সঙ্গে রয়েছে দাসী আসুক নামি',
রঙিন তোরঙখানি নামাও থামি'।
গোরু দুটি খেতে চায় ধুঁকিতেছে পিপাসায়,
গোয়ালে লইয়া যাও, উঠেছে ঘামি'।

অচেনা লোকের বাড়ি হবে না থাকা ?
যাও তবে, বড় রোদ ; বৃথাই ডাকা !
ধুলা রোদ অনাহার ক্লেশ পাবে মা আমার
মাঠে গিয়ে তুলে দিও পরদা ঢাকা।

কে আছে গাড়ির মাঝে দেখিনি চেয়ে
কাচের চুড়ির ধ্বনি জানায় কে এ।
রঙিন তোরঙ, শাড়ি কহিছে বয়স তারি,
যেই হোক, মনে হ'ল আমারি মেয়ে।

চাকায় বেদনাভরা কাঁদন তুলি
চলে গেল নব বধূ উড়ায়ে ধূলি।
বৈশাখী রবিকরে দগ্ধ গাঁয়ের পরে
একখানি কালো মেঘে হানি বিজুলী।

ফিরিয়া আসিনু বাড়ি নয়ন মুছে,
সারাদিনে কিছুতে না সে ব্যথা ঘুচে।
নিজের দুলালী যেন অনাহারে গেল হেন
মনে হয়, খেতে গিয়ে ভাত না রুচে॥

বাংলা ভাষা

॥ অতুলপ্রসাদ সেন ॥

আ মরি বাংলা ভাষা !
মোদের গরব, মোদের আশা !
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা ॥
কি যাহু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনলে দেশে ভক্তি ধারা ;
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা ॥
বিদ্যাপতি-চণ্ডী-গোবিন,
হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন,
ওই ভাষারই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা ॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনলে মালা জগৎ জিনে ;
তোমার চরণতীর্থে মাগো জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকলাম মায়ে 'মা মা' ব'লে,
ঐ ভাষাতেই বলবো 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা ॥

।। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।।

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণী ! জগদ্ধাত্রি !"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

সদ্যঃ স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত,
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্র ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনী ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

শীর্ষে শুভ্র-তুষার-কিরীট, সাগর উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়াছে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিছে প্রলয়-সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ।
জগৎপালিনি ! জগত্তারিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনী ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

॥ চতুর্থ স্তবক ॥

॥ নিশিকান্ত রায়চৌধুরী ॥

ঝিনুকমোড়া মুক্তো কাঁদে, পাথর-চাপা জল ;
কাঁটার মধ্যে লতা কাঁদে, পাতার মধ্যে ফল।

সেই মুক্তোর মধ্যে আছে সপ্তসমুদ্দুর !
পাথরচাপা সেই জলে রয় তেরো নদীর সুর,
আমি সেই সুরে গান গাই।
সেই লতাটির কাঁটায় ঘেরা রুদ্ধ কুঁড়ির মাঝে
কুসুমপুরীর রাজকুমারীর রূপের মানিক আছে,
আমি সেই মণিটি চাই—
পাখির মতন ব'সব গিয়ে সেই ফলটির কাছে,
আমি কেমন করে পাবো সে ফল ডানা আমার নাই !

ডিমের মধ্যে তাই তো কাঁদে, কাঁদে আমার পাখি,
হিমের মধ্যে আগুন কাঁদে, ঘুমের মধ্যে আঁখি।
ঘুমভাঙানি মাগো আমার, ঘুমভাঙানি মা
আমার ঘুম ভাঙালি না !

হিমের মধ্যে আগুন কাঁদে, জ্বালবি নাকি তারে ?
জ্বালবি না মা ! আমার শীতের রাতের অন্ধকারে ?

স্বপন দেখি তোর সাথে মা সূয্যিমামা আসে,
কাজল দীঘির কালো জলে সোনার কমল ভাসে,
আমি সেই আলো গায় মাখি।
সোনার আলোর পরশে মোর সোনার কমল ফোটে
সেই কমলের মধুর লোভে মৌমাছিরা জোটে ;
আমি মৌমাছিদের ডাকি
আমার ঘুমে সেই ডাকেতেই তাদের যে ঘুম টোটে।
তাই, হয় যে মনে গুঞ্জরণে তাদের সনে জাগি।

তাই তো ঘুমের কান্নাতে মোর সেই কমলের হাসি
সেই হাসিটির অধর বাজায় শুকতারাটির বাঁশি।
ঘুমভাঙানি মাগো আমার, ঘুমভাঙানি মা!
আমার জনম জনম গেল তবু ঘুম ভাঙালি না—
আমার ঘুম জাগালি না।

———
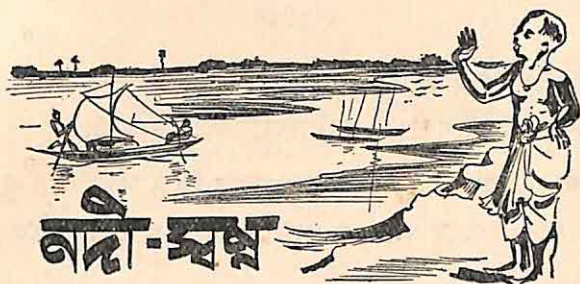
॥ বুদ্ধদেব বসু ॥

কোথায় চলেছ? এদিকে এসো না! দু'টো কথা শোনো দিকি,
এই নাও—এই চকচকে, ছোট, নতুন রূপোর সিকি।

ছোকানুর কাছে দু'টো আনি আছে, তোমাকে দেব গো তা-ও
আমাদের যদি তোমার সঙ্গে নৌকোয় তুলে নাও।

আমারে চেনো না? মোর নাম খোকা, ছোকানু আমার বোন,
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা মেঘ্না-পদ্মা-শোন্।

দিদি মোরে ডাকে গোবিন্দচাঁদ, মা ডাকে চাঁদের আলো,
মাথা খাও, মাঝি, কথা রাখো! তুমি লক্ষ্মী, মিষ্টি, ভালো!

বাবা বলেছেন, বড় হয়ে আমি হব বাংলার লাট,
তখন তোমাকে দিয়ে দেবো মোর ছোটবেলাকার খাট।

চুপি চুপি বলি, ঘুমিয়ে আছে মা, দিদি গেছে ইস্কুলে,
এই ফাঁকে মোরে—আর ছোকানুরে—নৌকোয় লও তুলে'।

সবগুলো নদী দেখাবে কিন্তু। আগে চলো পদ্মায়,
দুপুরের রোদে রূপো ঝলমল সাদা জল উছলায়।

শুয়ে শুয়ে মোরা দেখিব আকাশ—আকাশ ম—স্ত বড়,
পৃথিবীর যত নীল রঙ—সব সেখানে করেছে জড়ো !

কালো কালো পাখী বাঁকা ঝাঁক বেধে উড়ে চলে যায় দূরে,
উঁচু থেকে ওরা দেখিতে কি পায় মোরে আর ছোকান্নুরে ?

রূপোর নদীতে রূপোর ইলিশ—চোখ-ঝল্‌সানো আঁশ,
ওখানে ত্যাখো না—জালে বেঁধে জেলে তুলিয়াছে এক রাশ।

আমরা দু'জন দেখি বসে বসে—আকাশ কত না নীল,
ছোট পাখি আরো ছোট হয়ে যায়—আকাশের মুখে তিল।

সারাদিন যাবে—সূর্য ডুবিবে জলের নীচের ঘরে,
সোনা হয়ে যাবে পদ্মার জল, কালো হবে তারপরে।

ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ফুটিবে যখন, মাঝি, খুলে ফেলো পাল,
গান গেয়ো তুমি, দাঁড়ের শব্দে ঝপাঝপ্ রেখে তাল।

ছোকান্নু ঘুমায়ে পড়িবে তখনি, আমি তবু জেগে র'ব।
গান-গাওয়া হলে তোমাকে অনেক মজার গল্প ক'ব।

আমিও ঘুমায়ে পড়িব হয়তো বিছানা বালিশ বিনা—
মাঝি, দেখো তুমি ছোকান্নুরে, ভাই ; ও বড়ই ভীতু কিনা !

আমার জন্যে কোন ভয় নেই, আমি তো বড়ই প্রায়,
ঝড় এলে মোরে তুলিয়ো—ছোকান্নু যেন সুখে ঘুম যায়।

সব দেবো তোমা—এই ত্যাখো সিকি, এই আনি দুটো—তা-ও,
দয়া করে ভাই মোরে-ছোকান্নুরে নৌকায় তুলে নাও।

চাঁদের বোন উদয় তারা

॥ জসীম উদ্‌দিন ॥

চাঁদের বোন উদয় তারা ফুল তুলতে যায়,
সোনার নূপুর ঝামুর ঝুমুর বাজে রাঙা পায়।
দুধাল মেঘের পথটি গেছে নীলের পারাবার,
সেখান দিয়ে চলেছে সে চরণ ফেলি তার।
চলেছে ত চলেইছে সে, নীলান্তরের মাঠ
পেরিয়ে গিয়ে ধরলো সে যে তেপান্তরের বাট।
মাঠের শেষে বট বিরিক্ষি, তারি একটি ডালে
বসে আছেন শুক-শারিকা নীম্ সন্ধ্যাকালে।
"কে যায় রে গাছের তলে নূপুর বাজে কার ?
কোন্ দেশেতে বসত-বাটী নামটি কিবা তার ?"
"চাঁদের বোন উদয় তারা ফুল তুলতে যাই,
ফেরার পথে তোমার সাথে বলব কথা ভাই "
"মিঠে তোমার কথা কন্ঠে, মিঠে তোমার স্বর,
ফেরার পথে আমায় দিও চম্পা নাগেশ্বর।"

চাঁদের বোন উদয় তারা চলেই কেবল চলে,
ঘোরকুষ্টি অন্ধকারে মাঠের পথটি দলে।
সামনে দেখে উজান নদী একলা খেয়াঘাট,
নাইক তরী, নাইক মাঝি জনশূন্য বাট।

"কর্ণধার, কর্ণধার, মাঝি কর্ণধার,
ময়ূরপঙ্খী নৌকা নিয়ে গাঙটি কর পার।"

ডাকের চোটে কর্ণধার উদয় হল ঘাটে,
চাঁদের বোন উদয় তারা বসলো নায়ের পাটে।

কর্ণধার বলে "কন্যা! করবো নদী পার,
ফেরার পথে আমায় দিও মন-পবনের দাঁড়।"

উজান নদী পার হইয়া সামনে বালুচর,
সাদা সাদা বকের ছানা খেলছে তাহার পর।

জনমানবের নাইক সাড়া শুকনো বালু লয়ে,
বাতাস কেবল খেলছে খেলা একলা বিভোর হয়ে।

বালুর উপর গড়িয়ে পড়ে ছড়ায় বালু গায়,
বালুর আঁচল উড়িয়ে কভু আকাশ পানে ধায়।

চাঁদের বোন উদয় তারা চলেই কেবল চলে,
কতদিন যে চলবে এমন কেই বা দিবে বলে।

না জানি কোন বনের ধারে চম্পানাগের মালা,
বিনি-সুতোয় গেঁথে আজি জাগে সে কোন বালা!

কোন তটিনীর ঢেউএর পরে মন-পবনের দাঁড়,
উজান সোতে ভেসে ভেসে খোঁজ করিছে কার!

কোন মালিনীর ফুলের বাগে রাতের নীহার সনে,
বিদেশী এক রাজার কুমার ঘুমোয় ফুলের কোণে!

চাঁদের বোন উদয় তারা চলেই কেবল চলে,
কোথায় ফোটে চম্পাকলি কে দেবে তায় বলে !

জাগবে কি সে রাজার কুমার নূপুর শুনে তার,
চলতে পথে পাবে কি সে মন-পবনের দাঁড় !

হয়তো এ সব পাবেই না সে, হয়তো বা ভুল করে,
পথ ফেলে সে চলেই যাবে আর একটি পথ ধরে।

হয়তো সেথা অনেক বিপদ ঘিরবে তারে হায় ;
চাঁদের বোন উদয় তারা তবুও পথে ধায়—

নিকষ-ঘন রাতের আঁধার, আকাশ-প্রদীপ জ্বালি,
একলা পথে চলেছে সে আপন মনে খালি।

———

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই

॥ সুকুমার রায় ॥

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই চড়ি সখের বোটে,
মাঝিরে কন, 'বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে ?
চাঁদটা কেন বাড়ে কমে ? জোয়ার কেন আসে ?'
বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফেলিয়ে হাসে।
বাবু বলেন, 'সারা জনম মরলি রে তুই খাটি,
জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাটি।'

খানিক বাদে কহেন বাবু, 'বলতো দেখি ভেবে,
নদীর ধারা কেমনে আসে পাহাড় থেকে নেবে ?
বলতো কেন লবণপোরা সাগরভরা পানি ?'
মাঝি সে কয়, 'আরে মশাই অতো কি আর জানি !'
বাবু বলেন, 'এই বয়সে জানিস্‌নেও তাকি ?
জীবনটা তোর নেহাৎ খেলো অষ্ট আনাই ফাঁকি।'

আবার ভেবে কহেন বাবু, 'বলতো ওরে বুড়ো,
কেন অমন নীল দেখা যায় আকাশের ঐ চুড়ো ?
বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন ?'
বৃদ্ধ বলে, 'আমায় কেন লজ্জা দেছেন হেন ?'
বাবু বলেন, 'বল্‌ব কি আর, বলব তোরে কি তা,
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনাই বৃথা !'

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন নৌকাখানি ডুবলো বুঝি দুলে !
মাঝিরে কন, 'একি আপদ ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবলো নাকি নৌকা এবার ? মরব নাকি আজি ?'
মাঝি শুধোয় 'সাঁতার জানো ?' মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, 'মশাই এখন কেন কাবু ?
বাঁচলে তবে আমার কথা হিসেব করো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।'

শ্রমিকের গান

॥ কাজী নজরুল ইস্‌লাম ॥

ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে
পাহাড় টলে তুষার গলে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে !

মোরা সিন্ধু ম'থে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই মোদের বলে হ'তেছে পার
হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার
সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে !

তবু মোরাই জনম চল্‌ছি ঠেলে
ক্লেশ-পাথারের সাঁতার জল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

আজ ছ' মাসের পথ ছ' দিনে যায়
কামান গোলা রাজার সিপাই,
মোদের শ্রমে মোদেরি সে কৃপায় রে !

ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে
ঐ ভুড়োঁদের উড়োকল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল ॥

ও ভাই দালান-বাড়ি আমরা গড়ে
রইনু জনম ধুলায় পড়ে,
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে!

আমরা চিনির বলদ চিনিনে স্বাদ,
চিনি বওয়াই সার কেবল।
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি
আমরা মুটে, কল্ খালাসী!
ডুবলে তরী মোরাই তুল্তে আসি রে!

আমরা বলির মত দান করে সব
পেলাম শেষে পাতাল তল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের !

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায় !

মাটির বাসনা পূরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দন্ত তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশারে দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি !

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।
কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে-সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায় ;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
—কুঠার ঘায়।
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই!

———

॥ অজিত দত্ত ॥

উল্টো রথের বাজ্না বাজে শুনতে পাও ?
শুনতে পাও ? কেউ কোথাও ?

বাজনা বাজে উল্টো রথের নতুন পথের বাত্তি,
আত্তিকালের রাজপথে আর রথ টানে কার সাধ্যি ?
চলতি সড়ক রয় পিছনে, সামনে রথচক্রে
নতুন পথের দাগ কেটে যায় দিগন্ত ইস্তক রে !
দুর্গম পথ হয় সমতল রথের চাকার নিচে
রথ চলে আজ সাম্নেটাকে উল্টে ফেলে পিছে !
উল্টো পথের রথের রশি টান্‌ছে কা'রা দেখতে পাও ?
দেখতে পাও ? কেউ কোথাও ?

বাজনা বাজে হাওয়ায় রে ভাই, বাজনা বাজে শূন্যে,
উল্টো পথে রথ চলেছে উল্টো দেশের পুণ্যে।
ঘুম ভরা চোখ হঠাৎ জাগে সামনে নতুন দৃশ্য,
গঙ্গা থেকে জন্মালো কি লক্ষ কোটি ভীষ্ম ?
জগন্নাথের স্থবির রথে প্রতিষ্ঠা আজ আত্মার,
রথের রশি টানবে না যে আজকে যাবে জাত তার।
উল্টো পথে রথ চলে আজ কোন্ আবেগে জানতে চাও ?
জানতে চাও ? কেউ কোথাও ?

রথের তারিখ ফুরিয়ে গেছে, উল্টো রথের য়াত্রা আজ,
শুনছো না কি রথের চাকায় সুদর্শনের ভীম আওয়াজ ?
প্রচণ্ড সে খণ্ড করে বিঘ্নরূপী দম্ভাসুর,
উল্টো রথের উৎসবে তাই চিন্তা কি ভয় নেই কিছুর।
সুপ্ত মনের শান্ত হ্রদে গর্জে শোনো সিন্ধু,
উল্টো রথের শ্রীক্ষেত্রে নেই অহিন্দু কি হিন্দু।
উল্টো রথের বাজনা বাজে,—বাজনা বাজে শুনতে পাও ?
শুনতে পাও ? কেউ কোথাও ?